

ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା]

ଆଷାଢ଼ ୧୩୨୧

[ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ

ସବୁଜ ପତ୍ର

ସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀପ୍ରମଥ ଚୌଧୁରୀ

সবুজ পত্র

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে',
কেমন করে সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে'
এ কি রে দুর্দৈব !
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে,
চলবি যারা চলরে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক !
ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ !

চলেছিলেম পূজার ঘরে
 মাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য ।
 খুঁজি সারাদিনের পরে
 কোথায় শান্তি-স্বর্গ ।
 এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
 ভেবেছিলেম হবে গত,
 ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
 হব নিষ্কলঙ্ক ।
 পথে দেখি ধূলায় নত
 তোমার মহাশঙ্খ ।

তারতি-দীপ এই কি জ্বালা ?
 এই কি আমার সন্ধ্যা ?
 গাঁথব রক্ত-জবার মালা ?
 হায় রজনীগন্ধা !
 ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
 মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
 চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
 লব তোমার অঙ্ক ।
 হেনকালে ডাকল বুঝি
 নীরব তব শঙ্খ !

যৌবনেরি পরশমণি
 করাও তবে স্পর্শ !
 দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
 দীপ্ত প্রাণের হর্ষ ।
 নিশার বক্ষ বিদার করে'
 উদ্বোধনে গগন ভরে'
 অন্ধ দিকে দিগন্তুরে
 জাগাও না আতঙ্ক !
 দুই হাতে আজ তুলব ধরে'
 তোমার জয়শঙ্খ ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
 রইবে না আর চক্ষে ।
 জানি শ্রাবণ-ধারাসম
 বাণ বাজিবে বক্ষে ।
 কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
 কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
 দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
 সৃষ্টির পালক ।
 বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
 তোমার মহাশঙ্খ ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে

পেলেম শুধু লজ্জা ।

এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে

পরাও রণসজ্জা ।

ব্যাঘাত আসুক নব নব,

আঘাত খেয়ে অটল রব,

বক্ষে আমার দুঃখে, তব

বাজ্বে জয়ডঙ্ক ।

দেব সকল শক্তি, লব

অভয় তব শঙ্খ !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তুপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকীব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সম্ভাষণ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালীবন-রাজির নীলতম প্রাপ্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তুণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর

সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্ধ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মগ্নিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আখ্যাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোকর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মস্তুর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপান্নের উছোগে-চেকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তল্লি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই ত শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্কা, বসন্তের স্নগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি কুলকাটা। ইহারা যে পাতুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই ত পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাৎ জোড় মেলাইবার জন্ম। তাহারা জানেনা বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির ষত বাহার। ৩৬৫ দিনকে

দুই দিয়া ভাগ কর—৩৬ পর্যন্ত বেষ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোটো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল খামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্ত কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সঙ্গীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-সয়তানটা এই কাজ করিবার জন্মই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনো-মতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না;—সেই ত নৃত্যপরা উর্বরশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্গের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড় ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এই জন্ত বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্কক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিষ একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া

নাড়াচাড়া করাতেই তাহার সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্ম ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্ম সেখানে তাহার তিন মহল ; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ত্রাণগ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না ;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারি সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই ; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মত মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদাগুতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বসন্ত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্ভূত।

এই জন্ম বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার

নাই ; ফলেও অধিকার নাই । তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে ;—
কর্ম্য হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি ।

বর্ষা-ঋতুটাতে ফলের চেষ্ঠা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মের প্রতিকূল । এই জন্ম বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায় । ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই । এই জন্ম কাজ-কর্ম্মের আপিসে বা লাভ-লোকমানের বাজারে সে আপনার পাঙ্কীর বাহির হইতে পারে না । সেখানে সে পর্দা-নসিন ।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায় । বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না । বাদলার কর্ম্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয় । একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন ।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিনীর পক্ষে বড় সহজ সময় নয় । তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবী লইয়া সম্মুখে আসে । এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখা কে ?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের । সেটা পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের বিপরীত । সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবী । সরকারী হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে ।

মনে কর, খামখা এত বড় আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে ত কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারো কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই নিস্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিষ যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবী করে; সেই জন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতি-কাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিস্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অঙ্ককারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঁঞ্চল্যে, তাহার গাঙ্গীয়ে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে? এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষার ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সঙ্গীতের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা সঙ্গীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্ম কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। বাবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্ম আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্ম মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে, হেমন্তে, ভরা-মাঠ, ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব বাস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজুরা দিতে আসে না—যেখানে অথগু অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিষ নয়। লোকালয়ের হাতে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাভণ্য ঐ বায়ু-মণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধর, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ু-মণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিস্তৃত লোকের

অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে ? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ঐ শূণ্ণে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে ; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে ; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মাগু করে বটে কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কি কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পঙ্কের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ ; সেই জগৎ উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—স্বর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থ-পিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু ভানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইসারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়। ইহাদের পরিচয় তদ্বিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়াল কথার লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই মানা

রঙিন আলোর রং ফলাইবার সূযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্ম অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্ম হৃদয় অবকাশ দাবী করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবীটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা কাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ--পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনার কেবলি

যে সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ ত সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু তখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের

যে ভয়ঙ্কর ঢলা তাহার রুদ্ধবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখ
ঐ নক্ষত্র-মণ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগযুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে । যে
নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায় ।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস
যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অগ্নান মালাটি পরাইয়া
বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা “আষাঢ়ে” বলিয়া
অবজ্ঞা করে । তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুষ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর
মাসটি সকল-কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরার
কেবল বাজে-কথার পণ্য ! অন্তায় মনে করে না । সকল-কাজের-
বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার
অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে
নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার
ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবধনশ্যাম, আমরা তোমাঞ্চে
অভিবাদন করি । এস এস জগতের যত অকর্মণ্য, এস এস
ভাবের ভাবুক, ঝসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এস
সমস্ত ক্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে । বিশ্বের
চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর
মানা মানিল না । এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট
পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে
আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনাস্ত হইতে সজল
বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের
চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বোফনী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয় এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী ত নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয় সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া এক-ঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিকে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই ত স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্ভ্রনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারিদিকে যে টোল খাইয়া যায় বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃত্তে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলসুখে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার বেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে।

আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই ; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব । এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে—আমিও নিশ্চিন্ত আছি ।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে ; অন্তত বোকা ভাবে নাই ।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা । কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল । আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়টার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম । তাহার চিকণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দরজির দোকান বানাইয়াছে ইহার মত এমন অপব্যয় আর নাই ।

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল । তাহার ঔঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুইচার রকমের ফুল ছিল । তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল—আমার ঠাকুরকে দিলাম ।—বলিয়া চলিয়া গেল ।

আমি এমনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসররৌদ্রে ল্যাজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীব-লীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল আমি দেবতাকে সন্মুখ করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সে বার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূর্বের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দীবোষ্ঠমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না, অন্তমনস্ক হইয়া বলিলাম, আচ্ছা এইখানে নিয়ে আয়!

বোষ্ঠমী পায়ের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহার, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে

চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কি-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড় বড় চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিষকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, এ আবার কি কাণ্ড ? আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন ? তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল !

বুলিলাম গাছ-তলায় এ আমাকে অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েক দিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকালের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি—তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্কণ খামিয়া সে বলিল, গোর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। বলিলাম, উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চূপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।

বোষ্টমী ভারি খুসী হইয়া গোর গোর বলিয়া উঠিল। কহিল, ভগবানের ত শুধু রসনা নয় তিনি যে সর্ববাস্তু দিয়া কথা কন।

আমি বলিলাম, চূপ করিলেই সর্ববাস্তু দিয়া তাঁর সেই সর্ববাস্তুর কথা শোনা যায়। তাই শুনিতোই সহর ছাড়িয়া এখানে আসি।

বোষ্টমী কহিল, সেটা আমি বুঝিয়াছি তাই ত তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিলাম আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড় বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধূ ধু করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশ-বনে ঘেরা গ্রামের পাশে আখের ক্ষেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘনছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা-মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কিনা জানিনা। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মত গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা-আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মত করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্বদিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মত একসময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল, এবং ঐ সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মত আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্ত লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে

করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল।
আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।

আমি বলিলাম, সে কি কথা ?

সে কহিল, কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে ঢাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কি ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত-খাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কি খাইয়াছি, না খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিবুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সম্ভব। আমার মুখে বিষ্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টনী বলিল, যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার ত কোনো দরকার ছিল না।

আমি বলিলাম, লোকে জানিলে তোমার উপর ত তাদের ভক্তি থাকিবে না।

সে বলিল, আমি ত সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহার ভাবিল আমার এইরকমই দশা।

বোষ্টনী যে-সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো, এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাহার

ইচ্ছা মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার চলে কি করিয়া ?

উত্তরে শুনিলাম তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আমার ত সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি; আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কি দরকার ছিল বল ত।

সহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষা-জীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথি-পড়া বিছার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোর্স্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না—আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল—না, না, এই আমার ভাল। আমার মাগিয়া-খাওয়া অল্পই অমৃত।

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অল্প জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অল্পে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর ঘরে মনে হয় আমারই অল্প আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোর্স্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয়

না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সবচেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরীবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি তাই বলিলাম, এই সকল দুর্ন্যতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো কর তাহা হইলেই ত ভগবানের সেবা হইবে।

এইরকমের সব উঁচুদের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অগ্ৰে শুনাইতেও ভালবাসি। কিন্তু বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, তুমি বলিতেছ ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই ত ?

আমি কহিলাম, হাঁ।

সে বলিল, উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই কি! কিন্তু আমার তাহাতে কি? আমার ত পূজা ওখানে চলিবে না—আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কি হইবে? সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড় বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যিক যে আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া-শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও ত কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার একি আশ্চর্য্য প্রণালী!

পরদিন সকালে বোর্স্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন? যখনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!

আমি বলিলাম, যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া-থাকিতে দেন না পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজা-জোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া!

হাতজোড় করিয়া সে বলিল, গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কি ঠাণ্ডা! কি কোমল! কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে ত খুব হইল।

তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? প্রভু, এ আমার মোহ নয় ত, ঠিক করিয়া বল !

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল । মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল ।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাস্ ? এ ফুলগুলি হইয়া গেল ? তোমার আর দরকার নাই ? তবে দাও দাও, আমাকে দাও !

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া কতক্ষণ মাথা নত করিয়া একান্ত স্নেহে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, তুমি চাহিয়া দেখনা বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায় । যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে ।

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই ।

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না । আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মত প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি ।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল । কহিল, আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি । আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, পাগলি, কাকে ভক্তি করিস

তুই ? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে । হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয় ?

কেবল একমুহূর্তের জন্য মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল । কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায় !

বোম্বটমী বলিল, বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিতাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে । কিন্তু এত তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন ! আমার গোর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো ?

আমি বলিলাম, আমার পাওনা আছে বলিয়া । আমি হয় ত একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম ।

বোম্বটমী কহিল, মানুষের মনে বিষ যে কত সে ত দেখিলে । লোভ আর টিকিবে না ।

আমি বলিলাম, মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয় । তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায় । তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন ।

বোম্বটমী কহিল, দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান । শেষ পর্য্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায় ।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যা-ভারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল--বোম্বটমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল ।

আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ । কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম । কিন্তু আমি জানি যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে ।

ইহাও দেখিয়াছি তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে

ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আগাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয় সে ভালবাসা—এমন ভালবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কি সুন্দর রূপ তাঁর !

(বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন গুন করিয়া গাহিল—

অরুণ-কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি

কোন্ বিধি নিরমিল দেহা ।)

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন—তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেই

জন্ম তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশিতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই। পাড়ার সহ-সাঙাঠীদের সঙ্গে মিলিবার জন্মই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্ম ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কি হইতে পারে? আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্ম ননী তৈরী নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা—আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মত তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্প-বয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না।

নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না এই জন্ম তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভাল-বাসিত। সে যেন বুঝিত সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্ম ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্ম সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্ম পারংপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁশেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, বাছা, ছেলেকে দেখিয়ে আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসিগে।

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দীঘিটা প্রাচীন

কালের—কোন্ রাণী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রাণী-সাগর। সাঁতার দিয়া এই দীঘি এপার-ওপার-করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কুলে কুলে জল। দীঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, মা! ফিরিয়া দেখি খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, আর আসিস্নে, আমি যাচ্ছি! নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কি দেখিতে হয়। এমন সময় পিছন ঘাটে সেই দীঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মত থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম কিন্তু আর সে মা-বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে জাঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন ত ভালো হইত কিন্তু তিনি ত কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলে-বয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা

করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলে-বয়সের বন্ধু বিছালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথী, ইঁহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না!

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জগ্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে ত হয় না। আমার কাছে সে সব কথার যা কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন—অমন সুধাপাত্র ত তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ত সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিত্তিকার মধুর মত ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহার-বিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদ পাইব প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জগ্য তরকারি কুটিতাম আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাখিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র—সেদিকে ত তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুসি করিতে পারি তাহাতেও এতদিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুসি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ তখন তিনি ভাবিতেন গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুসি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীরা কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটা মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়া-পথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আম-তলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্ একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাঁইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়সড় হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, তোমার দেহখানি সুন্দর।

ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে ঝোপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমার ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুখালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্বকিগুলি আমার চোখের উপর কেবলি নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহাৰ করিতে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্দী নাই কেন ?

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর-ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখন আমার স্বামীর মন যেন তারার মত ফুটিয়া উঠে। সেই আধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্ম বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া

দেখি আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রং ধরিয়াছে—তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, আর আমি সংসার করিব না।

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ কর। আমি বিদায় লইলাম।

স্বামী কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ ? তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল ?

আমি বলিলাম, গুরুঠাকুর।

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ; গুরুঠাকুর ! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন ?

আমি বলিলাম, আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন আদেশ কেন করিলেন ?

আমি বলিলাম, জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিযো, পারেন ত তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

স্বামী বলিলেন, সংসারে থাকিয়াও ত সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।

আমি বলিলাম, হয় ত গুরু বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে যুচিল।

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, চল না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়ালের জন্ম

(Terza Rima)

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার, জাতে আফ্গান ।
দিনে তাঁর নিত্য দোল, রাত্তিরে দেয়ালী ॥

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচ গান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্তকী ছুবেলা দিত রূপের যোগান ॥

ঘিরে তারে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ, কারো বা রবাব,—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী ॥

কারো হস্তে সপ্তস্বরী, যন্ত্রের নবাব,—
ললিত গস্তীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব ॥

সেকালে কেবলি ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ,—
ছয় রাগ হয়েছিল এত দরবারি,
এক পা নড়িত নাকো, বিনা পাখোয়াজ ॥

সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি,
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর,—
দুহাতে উঁচিয়ে ধরে' তাল-তরবারি ॥

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর,
বসেছে ইয়ার যত আমির-ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর ॥

দাড়িগোঁফে কেশেবেশে হোমরা-চোমরা
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান্ ।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা !

সহসা বিরক্তস্বরে কহে সুলতান,—
“শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান !

তাল আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার ।
সুরু করে দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার !

বিলম্বিত তালে যবে করগো বিলাপ,
মূর্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্ছাকে জিনিয়ে,—
নয়ত দুনেতে বকো সুরের প্রলাপ ॥

যে গান দুবেলা গাও ইনিয়-বিনিয়,
সে গানে জমক আছে, নাইকো চমক ।
তাল হতে নারো নিতে সুরকে ছিনিয়ে ॥

কারিগরি করে' যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,—
রাগ যেন রাগিনীকে দিতেছে ধমক !”

গুণীগণে পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব !
হেন সাধ্য নাহি কারো দুটি কথা কয় ॥

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙিয়া,—
মুহূর্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ব ॥

নর্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া,
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
মুক্ত হল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া ॥

বাদশা কহিল পুনঃ, রাঙা করি মুখ—
“নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত-নাযক
যে পারে সৃজিতে গীতে নতুন কোতুক ? .

সভাপ্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর,—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক ॥

জড়িত কম্পিত সুরে কহিল “হুজুর !
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্দন,—
সার জানি দুনিয়ায় সুরা আর সুর ॥

অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,—
কি যেন বৃকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন ॥

বাঁধা রাগ, গাঁথা তাল, এই দুই কুল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল !”

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর, মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়িয়ে দিল পাপিয়ার তান ॥

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিট্কারি,
যুবকের কণ্ঠ হতে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিট্কারি ॥

অবাক বাদশাজাদা, না পড়ে পলক,
চোখের স্মুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে, বিক্ষিপ্ত অলক !

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক ভেবে আত্মহারা !

শিহরিল নর্তকীর কর-কিশলয়,—
স্কুরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মণির বলয় ॥

শিকল ছিঁড়িয়া সুর, ভাঙিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল,—
সে গান কোঁতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ ॥

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল ।
নেশায় বাদশা হাঁকে—“বাহবা বাহবা ।”
ধ্রুপদীরা কহে রেগে—“ডাকিছে শেয়াল !”

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিম্বা স্বজাতির নাম উল্লেখ কর্বামাত্রই, একদলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন—ও সব কথা উচ্চারণ করবার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে' কোন-একটা বিশেষ দেশ নেই, এবং ভারতবাসী বলে' কোন-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ, এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্ম পায়ে হেঁটে তীর্থ-পর্যটন করবার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্রখানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি, ধর্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্মও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যিক নেই; চোখ কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—

আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের Utopia, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্ম্মর প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রক্তত সৌধ ও কনকচূড়ার সান্ধাৎলাভ করেছেন—তিনি আকাশরাজ্য হতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও-ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু, বাস্তবজগতের অজ্ঞতা-বশতঃ নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতঃই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনা-রাজ্য কখন কখন কালকের বাস্তব-জগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখন কখন ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য করে তোলা—অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোন লক্ষ্য না থাকায়, দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নিষ্কর্ষ, এবং ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য ideal unity, এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট ideal-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত Utopia ভবিষ্যতের অঙ্কন রয়েছে।

কিন্তু এই ideal-কে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরাজি সংবাদপত্র, অপর দিকে

বাক্সলা সংবাদপত্র, এই ideal-টিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন। উভয়েই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর বিক্রপবাণ বর্ষণ করেন। কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশী-শিক্ষালব্ধ, এবং সেই জন্মই স্বদেশী-ভিত্তিহীন—কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। ইংরাজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়, বহু ; এবং যা গোড়া হতেই পৃথক, তার আর কোনরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না ; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্থামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপরপক্ষে বাক্সলা-সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ সতরঞ্চের ঘরের মত চক-কাটা। এবং কার কোন্ চক, তাও অতি সুনির্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে, কে সিধে চলবে, কে কোণাকুণি চলবে, কে এক-পা চলবে আর কে আড়াই-পা চলবে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম। সুতরাং যারা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে ঐক্য চান, তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই—সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজ-তরী কোণাকুণি চলে তীরে আটকে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই-পা'র পরিবর্তে চার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং

ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের ideal-এর ভিত্তি আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবতঃ রাধাকুমুদবাবু দুহাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুর স্প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

(২)

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্ম তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্থ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সঙ্কান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্তা নিয়ে আমরা নিজেদের বিভ্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসম্ভব হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনও ঐক্য ছিল না। মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও জীবন-বৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে' এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশ-কুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বর-বাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে, বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে, এবং ভগবানকে তার অধিতীয় শাসন ও পালনকর্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ।

অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানারাজ্যে বিভক্ত, এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশ-দেশে বহু দেবতা এবং উপ-দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণতঃ মানুষে, মর্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী, সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক,—এবং যে দেশের পূর্ব-পক্ষ বহু-দেবতাবাদী, সে দেশের উত্তর পক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না ; কিন্তু বহুকে মায়া বলে' তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তর-মীমাংসার সার-কথা “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা”—এই অর্ক শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ, এবং শঙ্কর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ—এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্ম-জ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চায় আত্মার যতটা চর্চা করা হয়, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক ধর্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বলতে পারেন। সমাজ-ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিশ্বৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোহং হচ্ছে Individualism-এর চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্ত-মত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বন্ধ ও

সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি,—প্রতিহত হয়েছে। বেদান্তদর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়,—প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ কর্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবাদ ;—এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে, জীবের এই স্বরাট-জ্ঞান শুধু বিরাট অহঙ্কার মাত্র। সূত্রাং যে সূত্রে এ কালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা চের শূল জীবন সূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কোপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগা-চাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী, আর একজন শুধু উদাসীন,—পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুসি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীতসম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই

আছে ; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার করতে চাই তা সেখানে পাই ত ভালই ; না পাই ত, না পাই।

(৩)

জীবের অহং-জ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে, জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্ম-জ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হ'লেও যে একদেশ, এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অস্তুতঃ দু'হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে দুর্লভ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য। তারপর, এদেশ অসংখ্য যোজন বিস্তৃত হলেও সমতল ; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-ক্ষেত্র বলে অত্যাঙ্কি হয় না। বিদ্যাচল সম্ভবতঃ এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জঙ্গল নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হত। রাধাকুমুদবাবু দেখিয়েছেন

যে, এই স্বদেশ-জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি ;—সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র—ধর্মক্ষেত্র, প্রতি নদী—তীর্থ, প্রতি পর্বত—দেবতাত্মা। কিন্তু এই ভক্তি-ভাব আর্য্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চ নদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে রাখাকুমুদ বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম নয়, লৌকিক ধর্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম ; বিদেশী বিজেতা আর্য্যদের ধর্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে, সেই হচ্ছে অন্নদা, এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রস-সঞ্চার করে, সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এ সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জন হয়। “তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে” একথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদবাসী আর্য্যেরা মন্দিরও

গড়াতে না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, নৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগ ছিল, সেই যুগেই এই স্বদেশ-জ্ঞান ও স্বদেশ-প্ৰীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম অবৈদিক ধর্ম, এবং সার্বজনীন বলে' তা সার্বভৌম ধর্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম আৰ্য্যদের গৃহধর্ম, বড়-জোর কুলধর্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্মের ছিল না। যেমন অশুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশানকোণ ব্যতীত আর সকল-দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবতঃ ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-প্রভৃতি সংস্কৃত দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্ততঃ আকাশের দেবতারা যে, মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্মভাবের জন্ম। আৰ্য্যেরা যে কশ্মিনকালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চাননি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত-এবং-আৰ্য্যাবর্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে বৃণ্য শ্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের শ্লেচ্ছত্বদোষ কিম্বা আৰ্য্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মনিরত আৰ্য্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আৰ্য্যভূমি, — বাদবাকি সব শ্লেচ্ছদেশ। আৰ্য্যদের এই স্বজাতি-জ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশ-জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের

পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডুষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতী-আর্যেরা মহোৎসবের ভোজনাশ্বে “The Land we live in”-এর নামোচ্চারণ করে সুরার আচমন করেন। প্রাচীন আর্যজাতির মনে দেশ-প্ৰীতির চাইতে আত্ম-প্ৰীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাভিত্ত্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাভিত্ত্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন কোন বিরুদ্ধপ্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যা’তে করে আমার এই ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

(৪)

ইংরাজ যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন তা নয় ; আজ দু-হাজার বৎসরেরও পূর্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়া-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। একথা শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই জানা না থাক্, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন,—তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনা পরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে’ উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিম্বা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখন মুখে আনেননি; বরং বৌদ্ধাচার্যেরা যখন বেদের কোন উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবী করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা

কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয়, তা বৌদ্ধযুগে ত্রাত্যদেশে শূদ্র-ভূপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল। এবং অশোক, সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয়, ধর্ম্মচক্রেরও স্থাপনা করে, সসাগরা বসুম্ভরার সার্বভৌম চক্রবর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক-মনে পাওয়া যাবে কি না—সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে কোন একরাটের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিম্বদন্তী আছে,—সেই কিম্বদন্তীর সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোন ঘটনা না হোক, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদবাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মনোভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক-দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না; অতএব কোন বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে, তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর

মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাঙ্গলা অনুবাদ আছে ; তারি সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। “সম্রাট” কাকে বলে’ তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :—

“পূর্বদিকে প্রাচ্যগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান-অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্ত অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা “সম্রাট” নামে অভিহিত হন।”—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮শ অধ্যায়।)

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এস্থলে মাগধ-সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয়, তাহলে প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বরাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঐ সকল নাম উচ্চ-নীচ-হিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐ সকল নাম হচ্ছে পৃথক পৃথক দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল-দেশই পঞ্চনদের বহিভূত, কোন কোন দেশ ভারতবর্ষের বহিভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহিভূত। যথা—

“পূর্বদিকে প্রাচ্যগণের রাজা—সম্রাট। দক্ষিণদিকে সত্বংগণের রাজা—ভৌজী। পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট। উত্তরদিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্ত অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং উর্দ্ধদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।”

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশ-ভেদ-অনুসারে সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল,—পদমর্ঘ্যাদা-অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট, একসঙ্গে স্বরাট, বিরাট, সম্রাট, সব রাট হতে পারতেন,—অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশ-দেশের রাজা হতে পারতেন। বলা বাহুল্য, ঐরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। রাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুনরভিষেক, ঐন্দ্র মহাভিষেক,—এসব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞমানের অভ্যুদয় সাধিত হতে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে, পুরাকালে যাঁরা একরাট পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হতে তুলে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত রাজাগণের সার্বভৌম সাম্রাজ্য লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে,—কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে, ঐন্দ্র মহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্র-বাহিত পদলাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুণ আমরা উক্ত রাজযজ্ঞমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয়, এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারিনে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দটি তুলে দিতেন, তাহলে পাঠকমাত্রেই ঐতরেয়

ব্রাহ্মণের কথা কতদূর প্রামাণ্য তাহা সহজেই বুঝতে পারতেন।
ঐশ্বর মহাভিষেক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হত :—

বন্ধ শতকোটি গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যম্নিন সবনে দুই দুই সহস্র।
আটশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য খেত অখ। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত
নিষ্ককণ্ঠী আঢ়্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হলেও, গ্রহীতা আরও বেশি দুর্লভ।
এত গরু ঘোড়া ও বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন
বোধহয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদয় হত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই
পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের
কোষ-বুদ্ধি, এবং অধিকার-বুদ্ধির প্রতি লোভ ছিল, এবং তাঁরা
ব্রাহ্মণদের তন্তুর-মন্তুর-যাদুতে বিশ্বাস করতেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে
যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল
দ্বারা নয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ শত্রু
নাশের জন্তু তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যিক হত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম্ম
প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত। এই অতীত সাহিত্যের
ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়,
তাহলে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্ব্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের
পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা Spencer-এর বিলেতি মদ শঙ্করের
বোতলে ঢালি, Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং
তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে পান করে, তৃপ্তিও লাভ করি, মোহও
প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢোলাঢোলিও একটা সীমা
আছে। Bismarck-এর জার্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে

গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও হাতায় এ জিনিষ কিছুতেই ধরবে না। ইংরাজি শিক্ষার প্রনাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপারসকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি, এবং চাই কি তাতে কুতকার্যও হতে পারি,—কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, তদুপরি ইংরাজি ভাষার সাহায্যেও তার “আধিরাত্মিক” ব্যাখ্যা করতে পারিনে।

(৫)

এতদিন, প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ করবামাত্রই, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন, এই সকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদ্ভিত হত, এবং বঙ্গসাহিত্যে তারি গুণকীর্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ করতুম। Imperialism-নামক আহেল-বিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্বে কেউ বললে তার উপর আমরা খড়গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত করত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ Imperialism-এর উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কোর্টিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝলসে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে, সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিক্রম দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে, তখন আমরা এই প্রাচীন

Imperialism-কেও খুঁটিয়ে দেখতে পারব, এবং কোটিল্যাকেও জেরা করতে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন,—কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারি ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আৰ্য্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থশাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ Law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে এই lawএর মূল হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ legislation যে ধর্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন। অপরপক্ষে কোটিল্যের মতে রাজশাসন সকল-ধর্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনই মেনে নেন নি,—কেননা তাঁদের মতে ধর্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আৰ্য্য ঋষিদের স্মৃতি,—তার পর সদাচার, অর্থাৎ আৰ্য্যদের কুলাচার,—তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্মশাস্ত্রের মতে—“পারম্পর্য্যক্রমাগত” আৰ্য্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র Law। যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্যকর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রাহ্য করতেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই, চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ ঘেঁষ ক্রুরতা ও

কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম এবং সেই সঙ্গে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবতঃ আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংস-ব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধহয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্ষ্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য-গঠনে নয়—সমাজ-গঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে বাণিজ্যে নয়—চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে “পৃথিবীর সর্ব-মানবকে” আর্ষ্য-আচার শিক্ষা দেওয়া, এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে এক-সমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু সমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্ষ্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাভাব্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্ম তাঁরা যে দুর্গ-গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, অভিধানে, ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি,—যে ভাষার তুলনা জগতে নেই, সেই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্ষ্যেরা যে, সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্ম সমাজের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই; কারণ বর্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, Political problems-এর অপেক্ষা Social problems-এর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়ই হোক বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। Hamlet, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার যো নেই। কিন্তু, সঙ্গীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে এদেশে আর্ট, কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগ-রাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দোঁড় শুধু ঋষভ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তিনিও জানেন যে ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল, আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে—সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিক-পত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়ের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তা ছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে, তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে

রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হামলেটকে বাদ দিয়ে হামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনও শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাঙ্গলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পড় হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোন কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত ছুকুল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তাহলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে, পড়কে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে, মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যিক। সে কবিতার সঙ্গে সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোশ্বির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী,—শুকা না হলেও ক্ষীণা ; দামোদর নন্ যে, শব্দের বন্ধ্যায় বাঙ্গলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ, পরশ, সরস, হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলান যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে

আছেন। আমি যদি ঐ সকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তাহলে আমার চুরিবিষ্ঠে ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্য্যবৃত্তি কিনা—সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্য কবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃক-সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্য্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ ও-সব কথার আর কিছু পেটেন্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব, বিশেষতঃ যখন তাদের কোনও বদলি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার যো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্য কবিদের আর একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন, তাহলে পরবর্ত্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুণ সে স্মরণ হারিয়েছি বলে, আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্য-জগতের এমন কোনও নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই ?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন;—বাকী যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিম্বা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্ত্তির বর্ণনা করতে উচ্ছত হই, তাহলেও বড় স্তম্ভিত করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো,

রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায় । সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাকবে কিনা তা বলা কঠিন ।

কবিতার যা দরকার, এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেই সব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না । এ ঋতু পাখী-ছুট । বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দুর বক্তা,—চকোর আকাশ-দেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে' ফটিকজল শব্দ আর মুখেও আনে না । যে সকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখী—যথা বক, হাঁস, সারস, হাড়গিলে ইত্যাদি—এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, এরা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই । বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্য্যন্ত নয় । তারপর কাব্যের উপযোগী ফুল, ফল, লতা, পাতা, গাছ, বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন । সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্গ্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না—তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে । বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া । অপূর্বতায় পুষ্প-জগতে এ দুটির আর তুলনা নেই । অপরাপর সকল ফুল অর্ধ-বিকশিত ও অর্ধ-নিমীলিত । রূপের যে অর্ধ-প্রকাশ ও অর্ধ-গোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য, স্বর্গের অঙ্গরারা জানতেন । মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন । কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না

করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা—আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্তরূপ নেই—অপরের গুণগন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়,—অস্ত্র। গোলা এবং সঙ্গীনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পর্ষট।

পূর্বে যা দেখানো গেল, সে সব ত অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে;—দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা, সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণ-পবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়-পর্বত তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়;—সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো,—সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা ত সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা আমরা হয় সূর্য্যবংশীয়, নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং তবলীলা-সম্বরণ করে আমরা হয় সূর্য্যালোকে, নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনও ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই ছুরন্ত, এতই অশিষ্ক, এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে যে কোনও অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাশ্চাঞ্চল, এতই চঞ্চল, এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের

এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনই জন্মলাভ করে নি। আর এক কথা—বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ ঋতু শুধু বেথাপ্লা নয়,—অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয়, আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয় তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বক্ষিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণ-স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ক্রকম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয় ; তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বত্র শিহরিত হয়ে ওঠে। এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়,—ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড ছঙ্কার ;—সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরাজেরা বলেন, কে কার সঙ্গে রাখে তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা ?—পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা ! ইনি এক লক্ষ্যে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙ্গেন, গাছ ওপড়ান। আমাদের সোনার লক্ষা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য্য আমাদের ঘরে ঝাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাড়া করেন।

আর চন্দের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যাস্ত করে ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেসে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন ;—ইনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট! এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, সে কালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিষ নয় ;—নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনও মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ,—শান্ত দান্ত। সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ,—স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হৃষ্কার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ,—সে কনকনিকষ্মিগ্ন বিজুলির বাতি জ্বলে সূচিভেদে অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়,—কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সঙ্গীতজ্ঞ ;—তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মৃদঙ্গের সঙ্গত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ ত মেঘ নয়,—পুষ্পকরথে আরুঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ, মুরজ-ধ্বনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শীলারূপে করে না,—মধ্যে মধ্যে

পুষ্পরুষ্টি করে। এহেন মেব যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে ?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত, উচ্ছ্বল ; সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তাহলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান ? আমাদের মত শান্ত, সমাহিত, সুসভ্য জাতির পক্ষে বর্ষা নয়—হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয় কিন্তু শাস্ত্রের ; নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই প্রমাণিত হবে :—

“ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্ত হেমন্তে ওষধিসমূহ গ্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নাঁচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্টব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অগ্নের জন্ত নিজের করিয়া তোলেন।” (শতপথ ব্রাহ্মণ।)

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অগ্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানিনে ; এবং জানিনে যে তার কারণ, কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার—যে বর্ষা ওষধিসমূহকে গ্লান না করে, সবুজ করে তোলে।

বীরবল।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঘোর লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার ঢেউ ভেঙেছে
মেঘের থরে ।

গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল করে ।

ঝড়ে আজ বুলনো বুলে
তমাল তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয় চমকে তাকায় ।

বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নৃতন দলে ;
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায় সরে ।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা,
উড়বে চাতক, উড়বে তবু ।
বাহিরে কদম ফুটে
নুতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সায়রে ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।